শিশুসাহিত্যের ভাষা

আমরা সাধারণত যে শব্দগুলো প্রয়োগ করে কথা বলি, লেখকেরা সে শব্দগুলো দিয়েই সাহিত্য সৃষ্টি করেন। তবু আমাদের প্রতিদিনের ভাষা আর সাহিত্যে ব্যবহৃত ভাষা কিন্তু এক নয়। সেটা শিশুসাহিত্য বা বয়স্কজন পাঠ্য সাহিত্য যা-ই হোক কেন? লেখক আমাদের মুখের শব্দগুলো সাহিত্যে প্রয়োগ করেন সত্য, তবে একেবারে অপরিবর্তিত অবস্থায় প্রয়োগ করেন না, সাহিত্যে প্রয়োগের আগে শব্দগুলোকে প্রতিদিনের অর্থ থেকে মুক্তি দিয়ে বিশুদ্ধ করে নেন। বিশুদ্ধ করেন অনুভূতির রঙ ও ছন্দ দিয়ে, হোক তা পদ্য বা গদ্য। রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন-

"আলোর স্রোতে পাল তুলেছে হাজার প্রজাপতি

আলোর ঢেউয়ে উঠল মেতে মল্লিকা মালতী।"

তখন আমরা বুঝতে পারি আমাদের অতি পরিচিত সাধারণ শব্দগুলোই কবির অনুভূতির রঙ ও ছন্দে কী অসাধারণ ঔজ্জ্বল্য পায়! আসলে ভাষার সাহায্যে ভাষার অতীত পদার্থকে শ্রোতা বা পাঠকের হৃদয় সঞ্চারিত করার জন্য কবি-সাহিত্যিকরা ভাষার মধ্যে দুটো জিনিসের মেলবন্ধন ঘটান। সে দুটো জিনিস হলো গান ও ছবি। শব্দ-সুষমা ও ছন্দ মিল হচ্ছে গানের দিক আর উপমা রূপক ও অলঙ্কারের ব্যবহার হচ্ছে ছবির দিক। শরৎচন্দ্রের সাহিত্য থেকে কিছু অংশ তুলে এনে আমরা গদ্যে সরস চিত্রময়তা সাক্ষাতের স্বাদ নিতে পারি।

"নতুনদা একগলা জলে দাঁড়াইয়া অব্যক্তস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন- এই যে আমি!

দু'জনে প্রাণপণে ছুটিয়া গেলাম; কুকুরগুলো সরিয়া দাঁড়াইল এবং ইন্দ্র ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আকণ্ঠনিমজ্জিত মূর্ছিতপ্রায় তাহার দর্জিপাড়ার মাসতুত ভাইকে টানিয়া তীরে তুলিল। তখনো তাহার একটা পায়ে বহুমূল্য পাম্প, গায়ে ওভারকোট, হাতে দস্তানা, গলায় গলাবন্ধ এবং মাথায় টুপি- ভিজিয়া ফুলিয়া ঢোল হইয়া উঠিয়াছে। আমরা গেলে সেই যে তিনি হাততালি দিয়া 'ঠ্নু-ঠুন পেয়ালা' ধরিয়াছিলেন, খুব সম্ভব, সেই সঙ্গীতচর্চাতেই আকৃষ্ট হইয়া গ্রামের কুকুরগুলো দল বাঁধিয়া উপস্থিত হইয়াছিল এবং এই অশ্রুতপূর্ব গীত এবং অদৃষ্টপূর্ব পোশাকের ছটায় বিভ্রান্ত হইয়া এই মহামান্য ব্যক্তিটিকে তাড়া করিয়াছিল। এতটা আসিয়াও আত্মরক্ষার কোনো উপায় খুঁজিয়া না পাইয়া অবশেষে তিনি জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছিলেন; এবং এই দুর্দান্ত শীতের রাত্রে তুষারশীতল জলে আকণ্ঠমগ্ন থাকিয়া এই অর্ধঘণ্টাকাল ব্যাপিয়া পূর্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছিলেন। কিন্তু প্রায়শ্চিত্তের ঘোর কাটাইয়া তাহাকে চাঙ্গা করিয়া তুলিতেও, সে রাতে আমাদিগকে কম মেহনত করিতে হয় নাই। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে, বাবু ডাঙ্গায় উঠিয়াই প্রথম কথা কহিলেন আমার একপাটি পাম্প?"

শরৎচন্দ্রের এই যে সরস চিত্ররূপময় বর্ণনা- এটা তিনি আমাদের প্রতিদিনের শব্দ দিয়েই করেছেন। কিন্তু লেখায় ব্যবহারের আগে আটপৌরে পোশাক ছাড়িয়ে অনুভবের আওয়ায় তুলে তিনি বিশুদ্ধ করে নিয়েছেন শব্দগুলোকে। শব্দকে বিশুদ্ধ করার উপরই নির্ভর করে লেখকের সফলতা-ব্যর্থতা। বিশুদ্ধ করতে গিয়ে যে লেখক ভাষাকে সাধারণের মুখ থেকে বেশি দূরে সরিয়ে না নেন, তিনিই সফল লেখক। বয়স্কজনপাঠ্য এবং শিশুসাহিত্য উভয় ক্ষেত্রেই কথাটি প্রযোজ্য।

কিন্তু শিশুদের জন্য আলাদা সাহিত্য কেন চাই? চাই এ জন্য যে, বড়দের সাহিত্য শিশুদের পক্ষে সহজপাচ্য নয়। গুরুপাক খাদ্য তো বড়দের জন্যই সংরক্ষিত। তা হলে শিশু-কিশোরদের খাদ্য কী; মানে তারা কী পড়বে? বাংলার প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্বজ্জনেরা এই প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে আমাদের শিশুসাহিত্যের দ্বারোন্মোচন করেছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো বিশ্বনন্দিত সাহিত্য-মনীষীরা পর্যন্ত শিশুসাহিত্য রচনাকে অবশ্য কর্তব্যজ্ঞান করে শিশুমনোবিকাশের নানা দিক

নিয়ে ভেবেছেন।

এখন সাধারণত শিশুসাহিত্য বলতে আমরা শিশু ও কিশোরদের জন্য রচিত উভয় সাহিত্যকেই বুঝি। তবে আট-দশ বয়সী শিশুদের শব্দ সঞ্চয়, গ্রহণ ক্ষমতা ও বোধবুদ্ধি যতটা, এগারো-ষোলো বছর বয়সী কিশোরদের সেসবই বেশি বৈচিত্র্যপূর্ণ। ফলে একেবারে শিশুদের জন্য রচিত ভাষাশৈলী, প্রকরণ ও পরিবেশন-ভঙ্গি এবং কিশোরদের জন্য রচিত সাহিত্য সেগুলোর তারতম্য ঘটবেই। অবশ্য আগের তুলনায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার ও প্রযুক্তিগত কারণে একালের শিশু-কিশোরদের শব্দ ভা-ার যে বেড়েছে তা স্বীকার করতেই হবে। সে যাই হোক, আমাদের দেশে একেবারে শিশুদের জন্য রচিত সাহিত্যের পরিমাণ অল্প, অধিকাংশই কিশোর-সাহিত্য। শিশু-কিশোর সাহিত্য বয়স্করাও পড়ে থাকেন, তাদের ভেতরেও এক শিশুমন থাকে যে মনটি এ সাহিত্য থেকেও রসদ পেয়ে যায়, কিন্তু বয়স্কদের সাহিত্য শিশু-কিশোরদের গ্রহণযোগ্যতার বাইরের ক্ষেত্র। কেবল আদিরসটুকু বাদ দিয়ে লিখলেই শিশুসাহিত্য হয়ে ওঠে না, মনস্তাত্ত্বিক কারণেই ভিন্নতা অপরিহার্য, তা ছাড়া ভাষাবিন্যাসের ব্যাপার তো রয়েছেই। সারাজীবন শুধু শিশুসাহিত্য রচনা করেছেন- বাংলা ভাষার এমন লেখক অবশ্যই আছেন, কিন্তু সংখ্যায় তারা বেশি নন। যারা বড়দের জন্য লেখা লিখেই জনপ্রিয়, অধিকাংশ কিংবা বলা যায় সেরকম সকল লেখকই ছোটদের জন্য কম-বেশি লিখে এসেছেন। কিন্তু দুই শ্রেণির লেখককেই খেয়াল রাখতে হয় কাদের জন্য লিখছেন এবং তখন ভাষা-ব্যবহারের দিকটি অবশ্যই প্রাধান্য পায়। তবে এর পৃথক কোনো ভাষা নেই, দেখা যায় প্রত্যেক লেখকই, ছোটদের জন্য যখন লিখছেন, তখন নিজস্ব একটা স্টাইল তৈরি করে নিচ্ছেন- এ এক নিজস্ব শিল্পশৈলী নির্মাণ। তাই সেই স্টাইলের বৈচিত্র্যের সীমাও নেই। সাবলীল ও গতিময় ভাষা, ছোট ছোট বাক্য। বয়সোপযোগী শব্দসম্ভার এবং বাক্যের পর বাক্যে ছবির পর ছবি ফুটিয়ে তোলা, একদিকে কৌতূহল জাগিয়ে রাখা, অন্যদিকে এক বিস্ময়ের জগৎকে উন্মোচিত করা- শিশুমনকে ছুঁতে হলে শিশুসাহিত্য রচয়িতাকে এসব মাথায় রাখতেই হয়। সাহিত্য রস তো শিল্পসম্মত হওয়া চাই, শিশু-কিশোররা ছোট বলে তাদের অবোধ-অপরিণত ভাবলে চলে না, তারা আদৌ তা নয়, আবার অতিবোদ্ধাও নয়, তারা যাই তাই, সে কারণে তাদের জন্য সাহিত্য হওয়া চাই তাদের মনমতো।

শিশুসাহিত্য সৃষ্টির এই বিশেষ দিকটি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন বাংলা শিশুসাহিত্যের পুরোধা ব্যক্তিত্বরা। তাই শিশুশিক্ষার আদলেই শুরু হয়েছিল বাংলা শিশুসাহিত্য। সেই ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নের কথা। শিক্ষা বলতে তখন বর্ণমালা, কিছু শব্দ গঠন ও উপদেশাত্মক রচনা ইত্যাদি। মুদ্রণ ব্যবস্থার উন্নতি সঙ্গে সঙ্গে এর সূচনা হলেও বিদ্যাসাগরের হাত ধরেই শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে ফসল ফলতে শুরু করল। তবে সবই সাধুভাষায়, কেননা চলিতভাষা সাহিত্যে এল অনেক পরে। কিন্তু লক্ষ করার বিষয় এই যে, যিনি 'শকুন্তলা' লিখেছেন, 'এইরূপে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া রাজা শব্দানুসারে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, এক অতি অল্পবয়স্ক শিশু সিংহশিশুর কেশর আকর্ষণ করিয়া অতিশয় উৎপীড়ন করিতেছে, দুই তাপসী সমীপে দ-ায়মান আছেন।' সেই তিনিই 'বর্ণপরিচয়' প্রথম ভাগের ১৯ পাঠে লিখছেন, 'গোপাল বড় সুবোধ। তার বাপ মা যখন যা বলেন তাই করে। যা পায় তাই খায়, যা পায় তাই পরে, ভালো খাব ভালো পরিব বলিয়া উৎপাত করে না।' কিংবা 'বর্ণপরিচয়' দ্বিতীয় ভাগে সুশীল বালক, নবীন, মাধব, পিতামাতা, চুরি করা কদাচ উচিত নয় প্রভৃতি গল্পরসে সিক্ত গদ্যগুলোতে অত্যন্ত সহজ-সরল ভাষা ব্যবহার করেছেন, বাক্যগুলো হয়েছে ছোট-ছোট। বয়সের অনুপাত কতখানিই না ভাবতেন তিনি! সমসাময়িক মদনমোহন তর্কলঙ্কারের 'পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল' প্রভাত-বর্ণনার একটি সুন্দর কবিতা, এতে সাধু ক্রিয়াপদ থাকলেও শিশুদের গ্রহণ করতে অসুবিধে হয় না। তবে কিনা নীতিশিক্ষা প্রচ্ছন্ন রেখে সাহিত্যরসের আনন্দযজ্ঞে আমন্ত্রিত হতে শিশু-কিশোরদের আরো কিছুদিন অপেক্ষা করতে হয়েছে। রবীন্দ্রযুগ থেকেই তার ক্রমবিকাশ।

আমাদের শিশুসাহিত্য লোকসাহিত্য থেকেই উৎসারিত। পদ্যের ক্ষেত্রে যেমন যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'খুকুমণির ছড়া' তেমনি গদ্যের ক্ষেত্রে দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদারের 'ঠাকুরমার ঝুলি' আমাদের শিশুসাহিত্যের প্রাতঃস্মরণীয় বই। বিষয়ে বর্ণনায় ভাষায় এ যে অনন্য সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'এত

বড়ো স্বদেশি জিনিস আমাদের দেশে আর কী আছে?' দক্ষিণারঞ্জনের এসব বইয়ের ভাষার বৈশিষ্ট্য হলো- গল্পগুলোতে তিনি লোকভাষাকে যেন অবিকল তুলে এনেছেন, যদিও তা সাধুভাষায় লেখা। যেমন 'শঙ্খমালা' গল্পের একটু অংশ- 'বেলা বাড়ে বেলা উজায়, গাছের মাতা মর্মরিয়ে শুকায়; আর-আর দিন কাঠুরিয়া ইহার কত আগে কাঠের বোঝা আনিয়া দাওয়ার উপরে নামায়, আজ কাঠুরিয়া এতক্ষণও কেন আসে না? না, বেলা ক্রমে আরও বাড়িল,- ময়ূর-ময়ূরী পাখা ছাড়িল, শালিক-শারী ধূলি¯œান করিল, তখন কাঠুরানী, ব্যস্ত হইয়া ভাতের হাঁড়ি শিকায় তুলিয়া রাখিয়া ঝাঁপের দুয়ারে নিমগাছের ডালখানা পুঁতিয়া থুইয়া এক-কলসি কাঁখে এক-কলসি হাতে বাহির হইল।' সুরেলা ছড়া কেটে কথা বলার গ্রামীণ ধরনও কোনো কোনো গল্পে ঠাঁই পেয়েছে। 'ঠাকুরমার ঝুলি'র 'সাত ভাই চম্পা' ছাড়াও অন্য অনেক গল্পেও ভাষার এ বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়।

শিশুসাহিত্যের এই ভাষা বৈশিষ্ট্য আমরা পাই উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর 'টুনটুনির বই'তেও। গল্প বলার লোক ভঙ্গিটাই উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রয়োগ করেছেন তাঁর ভাষায়। যেমন-

"রাজার বাগানের কোণে টুনটুনির বাসা ছিল। রাজার সিন্দুকের টাকা রোদে শুকোতে দেয়া হয়েছিল। সন্ধ্যার সময় তার লোকেরা তার একটি টাকা ঘরে তুলতে ভুলে গেল।

টুনটুনি সেই চকচকে টাকাটি দেখতে পেয়ে তার বাসায় এনে রেখে দিল, আর ভাবলে, 'ইস! আমি কত বড়লোক হয়ে গেছি। রাজার ঘরে যে ধন আছে, আমার ঘরে সে ধন আছে!'

তারপর থেকে সে খালি এই কথাই ভাবে , আর বলে-

রাজার ঘরে যে ধন আছে

টুনির ঘরেও সে ধন আছে!"

'ঠাকুরমার ঝুলি' ও টুনটুনির বইয়ের পর বাংলা শিশুসাহিত্যে আরেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বই পল্লীকবি জসীমউদ্দীনের 'ডালিম কুমার'। জাদুকরী ভাষার এমন মোহনীয় বই বাংলা শিশুসাহিত্যে আর দ্বিতীয়টি নেই। শিশুসাহিত্যের আধুনিক ভাষা বিন্যাস ও শব্দ চয়ন নিয়ে আমরা যতই চমক সৃষ্টির চেষ্টা করি না কেন, দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, জসীমউদ্দীনকে অতিক্রম করা সহজ নয়। বাংলা শিশুসাহিত্যের ভাষা নির্মাণের ক্ষেত্রেও তাঁরাই অগ্রপথিক।

অবশ্য বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন যুগের জনপ্রিয় লেখকদের ভাষাশৈলীতেও আমরা এই ধারা লক্ষ করি। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, হুমায়ূন আহমেদ, ইমদাদুল হক মিলন, আলী ইমাম, আমীরুল ইসলাম থেকে শুরু করে তারুণ্যের প্রতিনিধি আহমেদ রিয়াজ পর্যন্ত সবারই ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো কথ্যভঙ্গি। কথ্যভঙ্গি লেখকের সঙ্গে পাঠকের একটা প্রত্যক্ষ যোগসূত্র তৈরি করে দেয়; অনেকটা বক্তা ও শ্রোতার মতো। সুতরাং ভাষা ব্যবহারে কথ্যরীতির অনুসরণ যে কোনো লেখকের পবিত্রতম কাজ। এ কাজটি হয়ে আসছে শিশুসাহিত্যের একেবারে সূচনা-পর্ব থেকে। আজো এই ধারা বহমান।

তথ্যসূত্র : ইন্টারনেট